ভূমিকা

সমাজ বলতে একটা জনসমষ্টিকে বোঝায়, যে সমষ্টির একটি সাধারণ ঐতিহ্য, প্রথা, জীবনপ্রণালী কিংবা একটি সাধারণ সংস্কৃতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একই সাথে বসবাস করে এবং সেই গোষ্ঠী সদস্য একত্রে সুদীর্ঘকাল বসবাসের ফলে পরস্পরের প্রতি সচেতনতা ও ইতিবাচক মনোবৃত্তি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ সমাজ বলতে পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এমন একদল জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা এক সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। মূলত: সমাজ ও সংস্কৃতির প্রত্যয় পরস্পর অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। একটি আরেকটির পরিপূরক।

সমাজ একপ্রকার সমষ্টিগত সত্তাকেই প্রকাশ করে। সমাজ বস্তুত ব্যবহারিকতা, নানা প্রক্রিয়ার নিয়ম-রীতি, কর্তৃত্ব, পারস্পরিক সহায়তা, বিভিন্ন গোষ্ঠী ও বিভাজন নিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীনতা দানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা একটি সতত পরিবর্তনশীল ব্যবস্থা। এভাবেই সমাজ সম্পর্কিত বিষয় বর্ণনায় অধ্যাপক ম্যাকাইভার এণ্ড পেজ তাঁদের Society নামক গ্রন্থে সংজ্ঞায়িত করেছেন — Society ... is a system of usages and procedures of authority and mutual aid, of many groupings and divisions, of controls of human behaviour and of liberties. The everchanging, complex system we call society. [১]
অর্থাৎ নির্দিষ্ট জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত একটি সংগঠিত ও সংযোজিত সমাহার হল সমাজ।

সমাজের একটি সাংগঠনিক রূপ থাকে। গোষ্ঠীবদ্ধতার মধ্য দিয়ে সমাজের পরিসর কাঠামোগত হয়। সেখানে অর্থনীতি, রাজনীতি, ধর্ম ও আত্মীয়তার উপর ভিত্তি করে সমাজ বিন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন ধরন গড়ে ওঠে। সমাজের প্রকারভেদে বিভিন্ন বিষয় ও পেশাবৃত্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। স্বাভাবিকভাবে রাজবংশী সমাজ সম্পূর্ণভাবে কৃষিজীবী সমাজ (agricultural society)। কয়েকশ' বছর ধরে এই কৃষিকে ঘিরেই সমাজ কাঠামো সুদৃঢ় হয়েছে। অন্যান্য সমাজের কিছু বৈশিষ্ট্য আত্মস্থ করলেও তা ব্যাপন (Diffusion) প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন উপাদান, প্রযুক্তি, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ধর্ম-আচার-প্রথা এমনকী ভাবনারও সম্প্রসারণ

ঘটেছে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায়। সেটা শুধু একরৈখিক বিবর্তনবাদে (Unilinear evolutionism) সীমাবদ্ধ নয়। অনেকক্ষেত্রে বহুরৈখিক (Multilinear evolutionism) থেকে সর্বজনীন বিবর্তনবাদেও (Universal evolutionism) সম্পন্ন হয়েছে। একরৈখিক বিবর্তনবাদের ধারা অনুযায়ী মাতৃতান্ত্রিক সমাজ থেকে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী সমাজে পিতৃতান্ত্রিক ধারার সূচনা হয়। ধর্মের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। আত্মায় বিশ্বাসের আদি ভাবনা থেকে সর্বপ্রাণবাদের (animism) রূপান্তর ঘটে। সেইসঙ্গে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আসে বহু ঈশ্বরবাদ (polytheism) এবং একেশ্বরবাদের (monotheism) ভাবনা। রাজবংশী সমাজের সরল সমাজ বিবর্তনের ধারায় জটিল সমাজে রূপান্তরিত হয়।

সমাজের সঙ্গে সংস্কৃতি একটি বিষয়। রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতি কতগুলি বৈশিষ্ট্য বহন করে যা গোষ্ঠী পরিচয়কে চিহ্নিত করে। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির পরিসর তৈরি হয় গোষ্ঠী ভাবনা ও জীবনযাপনের কৃত্যাদিকে ভিত্তি করে। ধারাবাহিক প্রক্রিয়ায় তা উন্নীত হয়েছে যাকে আমরা নৃ-গোষ্ঠীগত ভাবনায় বিবর্তন হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। অনেকগুলি ধাপ অতিক্রম করতে হয়েছে রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে। তবে মূলত কৃষি অর্থনীতিকে ভিত্তি করেই সংস্কৃতি আবর্তিত হয়েছে। কারণ কৃষিকে ঘিরেই রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি। সংস্কৃতি যেহেতু নৃবিজ্ঞানের ভাষায় কাজের সমার্থক 'man and his work' স্বাভাবিকভাবে সংস্কৃতি তাই মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব ব্যতিরেকে আর যা কিছু তার সত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়। সংস্কৃতি শব্দের মূল অর্থ যেখানে 'কর্ষণ করা' (ইংরেজি culture শব্দটি এসেছে জার্মান শব্দ 'kalture' থেকে যার অর্থ 'কর্ষণ করা')। তাই সাধারণত সংস্কৃতি বলতে আমরা নাচ-গান-পূজা-পার্বণ নয় সংস্কৃতি শব্দটির অর্থ আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত। এ প্রসঙ্গে ই. বি. টাইলর সংস্কৃতির সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে 'Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, customs and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.'[২]

রাজবংশী সমাজের সংস্কৃতির একটি নির্দিষ্ট ধরন অতীতে ছিল। বর্তমানে তা বিবর্তিত হয়ে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে। সংস্কৃতির বিভিন্ন দিকগুলি ধর্ম, শিল্প, সমাজ সংগঠন, প্রযুক্তি প্রভৃতির চরিত্র বৈশিষ্ট্য পরিবর্তমান। স্বাভাবিকভাবে সমাজ কাঠামোর সঙ্গে সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ধারাটি লক্ষণীয়।

উত্তরবঙ্গের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী রাজবংশী সমাজ। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারি অনুযায়ী রাজবংশী জনগণের ৭৭.১৯ শতাংশই এই উত্তরবঙ্গের বাসিন্দা। রাজবংশী জাতিগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহু বিতর্ক বিভিন্ন ভাবে উত্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সকলেই একমত হয়েছেন যে রাজবংশী জনগোষ্ঠী বৃহত্তর বোড়ো জনগোষ্ঠীরই একটি অন্যতম শাখা। মূলত: ইন্দোমঙ্গোলীয় হলেও কালের স্রোতে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির সংযোগ ঘটে। মধ্যপন্থা অবলম্বন করে অনেকে সংকর জাতি হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্বে রাজবংশীদের উৎপত্তি বিষয়ে বহু নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক, গবেষক এবং ব্রিটিশ সিভিলিয়ানরা রাজবংশী জনগোষ্ঠীর জাতিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব এবং সংস্কৃতি নিয়ে নানাবিধ কাজ করেছেন। আজকের সময়ের নিরিখে যা শুধু গুরুত্বপূর্ণ নয় অত্যন্ত মূল্যবান। বলা যেতে পারে তাদের অনুসন্ধান ও পরিসর ধরেই পরবর্তীকালে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা নির্ণীত করার চেষ্টা হয়। আবার রাজবংশী নৃ-গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ইতিহাসের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কযুক্ত রাজবংশী অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাচীন ইতিহাস অর্থাৎ প্রাগজ্যোতিষপুর, কামরূপ, কামতা ও পৌণ্ড্রবর্ধনের ইতিহাস তথা কোচবিহার রাজ্যের ইতিহাস। আজকের উত্তরবঙ্গ তার একটি ভূখণ্ড মাত্র। পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতবর্ষের মানচিত্রেও যা চিহ্নিত নয়। কিন্তু গঙ্গার পূর্ববর্তী সাতটি জেলা জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ 'উত্তরবঙ্গ' নামে সমধিক পরিচিতি পেয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি ভাবে স্বীকৃতিও পেয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। প্রশাসনিকভাবেও এই 'উত্তরবঙ্গ' নামটি ইদানীং ব্যবহৃত হচ্ছে। যদিও স্বাধীনোত্তর সময়ে এই উত্তরবঙ্গের চেহারাটি যথেষ্টই সংকুচিত হয়েছে কাঁটা তারের বেড়াজালে। তা সত্ত্বেও বর্তমান উত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের একটি অন্যতম অংশ এবং উর্বর সাংস্কৃতিক অঞ্চল। আর এই বর্তমান উত্তরবঙ্গের অন্যতম জনগোষ্ঠী হল এই রাজবংশী সমাজ। সুপ্রাচীন কাল ধরেই নিজস্ব ঐতিহ্য, পরম্পরা ও লোকায়ত ভুবনের অধিকারী এই জনগোষ্ঠী নানা সংশ্লেষণ ও বিবর্তনকে স্বীকার করেও নৃ-গোষ্ঠীগত চেতনায় নিজস্বতা বজায় রেখেছে। এই উত্তরবঙ্গের বাইরেও নিম্ন অসমের গোয়ালপাড়া, ধুবরী, কোকরাঝাড় জেলার বিশাল অংশ জুড়ে, বাংলাদেশের রংপুর, দিনাজপুর সহ নেপালের কিছু জেলায় এবং আমাদের বিহার, মেঘালয়, ত্রিপুরা প্রদেশেও এই জনগোষ্ঠীর মানুষ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন। 'পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও

রাজবংশী পরিচয়ের কিছু মানুষ বসবাস করে যদিও তাদের পেশা, বৃত্তিগত (তারা অধিকাংশই মৎস্যজীবী) দিক থেকে শুধু নয় উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের সঙ্গে তাদের দেহ গঠন, ভাষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও পার্থক্য লক্ষণীয়।[৩] গবেষকরা সামগ্রিকভাবে রাজবংশীর উদ্ভব নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। কারো মতে অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় গোষ্ঠীর বংশধর আবার কারও মতে মঙ্গোলীয় নৃ-শাখার অন্তর্ভুক্ত জনগোষ্ঠী অনেকে আবার মধ্যপন্থা অবলম্বন মিশ্র বা সংকর জাতি হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আবার রাজবংশী ও কোচ নিয়েও মতভেদ আছে। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিকদের মতে রাজবংশীরা মূলত: মঙ্গোলীয় পরবর্তীকালে দ্রাবিড়ীয় সংস্কৃতির সংযোগ ঘটে। ফ্রান্সিস হ্যামিলটন বুকানন-এর মতে অধিকাংশ রাজবংশীই হল কোচ এবং তাদের উৎস এক।[৪] ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে মন্টোগোমারি মার্টিন বুকাননের তথ্য সমূহের উপর ভিত্তি করে 'The History, Antiquity, Topography and Statistics of Eastern India' নামক গ্রন্থে সন্নিবেশিত বুকাননের রিপোর্ট (Account of the District of Rangpore, 1810) রাজবংশী জনগোষ্ঠীর ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য উপাদান। এই রিপোর্ট অনুসারে বৃহৎ বোড়ো নরগোষ্ঠীর অন্তর্গত কোচ ও রাজবংশীরা মূলত: এক জাতি। আবার এই রিপোর্টে একথাও বলা হয়েছে যে সমস্ত রাজবংশীই কোচ নয় তবে তাদের অধিকাংশই কোচ।[৫] রিজলীও বুকাননের মতটিকে সমর্থন করেন।[৬] শুধু তাই নয় রিজলী কোচ, রাজবংশী, পলিয়া, দেশীয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলিকে একই শাখার লোক বলেও বর্ণনা করেছেন।[৭] ১২৬১ খ্রিস্টাব্দে রচিত ফার্সি ইতিহাস গ্রন্থ 'তবকাত্-ই নাসিরী' তে 'কোচ-মেচ-থারু' এই সম্প্রদায়ত্রয়কে মঙ্গোলীয় শাখার লোক হিসাবে উল্লেখ করেছেন।[৮] আবার একদল ঐতিহাসিকদের মতে বিষ্ণুপন্থী রাজবংশীরা দ্রাবিড়ীয় এবং শিবপূজক কোচ সমূহ মঙ্গোলীয়।[৯] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় রাজবংশীদের মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর তিব্বত-ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার লোক বলেছেন। ভাষাচার্য চট্টোপাধ্যায় অনুমান করেছেন যে খ্রিস্টাব্দ গণনার সময়েই আসাম, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে তিব্বত ব্রহ্মদেশীয় ভাষা শাখার বৃহৎ বোড়ো জাতির মেচ-কোচ-কাছারি প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি বসতি স্থাপন করেন।[১০] ভাষাচার্য চট্টোপাধ্যায় এও বলেছেন যে কোচেরা নিজেদের রাজবংশী পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[১১] আবার রাজবংশীদের ধর্ম সম্পর্কে প্রায় সকল বরেণ্য পণ্ডিতগণের অভিমত যে কোচবিহার রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ বিশ্বসিংহের আমলে তা হিন্দুকৃত হয়েছে।[১২] তবে

এই বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়। রাজবংশীরা নিজেদের বংশপরম্পরায় ক্ষত্রিয় মনে করে।[১৩] নানা কারণে পরবর্তীকালে ভঙ্গ ক্ষত্রিয় বা ব্রাত্য ক্ষত্রিয়রূপে পর্যবসিত হয় এবং তারা মনে করেন রাজবংশী ও কোচ আলাদা। রাজবংশীরা পূর্বাপর হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন। বঙ্গদেশে যখন আর্যীকরণ ঘটে তখনই হিন্দুধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিকে রাজবংশীরা গ্রহণ করে। খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে যে রাজবংশীরা আর্যভাষাকে গ্রহণ করে তার সমর্থন মেলে হিউয়েন সাঙ এর বিবরণেও।[১৪] উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় হিন্দু এবং বঙ্গদেশের অন্যান্য হিন্দুশাখার সঙ্গে এদের ধর্ম-কর্ম্ম ও আচার অনুষ্ঠানের কিছু বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় শুধুমাত্র আঞ্চলিকতার প্রভাবে। যুক্তি হিসাবে বলা হয় পৌণ্ড্রদেশ থেকে রাজা মহাপদ্মনন্দের ভয়ে ভীত কিছু সংখ্যক পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয় করতোয়া নদী অতিক্রম করে রত্নপীঠ বা জল্পেশ দেশের অবস্থান ভূমিতে এসে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং ব্রাহ্মণের অভাব অদর্শনজনিত কারণে বৈদিক অনুষ্ঠানে বিরত থেকে ম্লেচ্ছ সংসর্গে ক্রমশ ম্লেচ্ছে পরিণত হয় ও ম্লেচ্ছ ভাষায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতেই সমগ্র উত্তরবঙ্গ মৌর্য সাম্রাজ্যের অধিকারে আসে এবং মৌর্য আনুকূল্যে তাদের অধিকৃত সমগ্র অঞ্চলেই বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার ঘটে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে সমগ্র আর্যাবর্তে বর্ণাশ্রম ধর্ম লোপ পায়। বেদ চিহ্নিত যজ্ঞবিধি বিরোধী বৌদ্ধদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই দেবদেবী সেবক হিন্দুবর্ণাশ্রম ধর্মী ক্ষত্রিয়দের সংঘর্ষ বাঁধে। নিজেদের ধর্ম ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য ক্ষত্রিয়দের কেউ কেউ আত্মগোপন করে। পরবর্তীকালে এরাই দক্ষিণবঙ্গের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় বা পোদ সম্প্রদায়ভুক্ত জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। অন্যেরা আদি বাসস্থান পরিত্যাগ করে উত্তরদিকের অরণ্যবেষ্টিত মঙ্গোলীয় উপজাতি অধ্যুষিত রত্নপীঠ বা জল্পেশ ও তার পার্শ্ববর্তী কামতাপুর বা কামরূপ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে রাজবংশী নামে আখ্যায়িত হয়। আবার প্রথম শতকে তিব্বত-চিনীয় গোষ্ঠীর অন্তর্গত বৃহৎ বোড়ো শাখার তিব্বতী-ব্রহ্মভাষী কোচ, মেচ, বোড়ো, কাছারি, রাভা ইত্যাদি উপজাতির লোকেরা উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। এই উপজাতিগুলির মধ্যে কোন কোনটি স্বতন্ত্র গোষ্ঠী হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম রক্ষণশীল অংশটি দ্রাবিড় গোষ্ঠীর লোকেদের সঙ্গে মিশে গিয়ে একটি সমন্বিত জনসমাজ গঠন করে। এই সমন্বিত জনসমাজই রাজবংশী সমাজ, যাদের সঙ্গে পরবর্তীকালে আর্যদের রক্তগত সংমিশ্রণ ঘটে থাকতে পারে অনুমান করা হয়।

প্রাচীনকাল থেকেই এই জনগোষ্ঠী আর্য ভাষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার চেষ্টা করছে এবং আত্মীকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যেই ভারতীয় আর্যভাষাকে নিজেদের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতির দিক থেকে আর্যীকরণের এই স্রোত এই জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও বর্তমান। এই সূত্রেই রাজবংশীরা নিজেদেরকে ব্রাত্য ক্ষত্রিয় হিসাবে দাবি করে।[১৫] পরবর্তীকালে তারা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সরকারি আধিকারিক ও সর্বভারতীয় ক্ষত্রিয় সমাজেরও স্বীকৃতি লাভ করে। তাছাড়া সামাজিক মর্যাদার দিক থেকেও রাজবংশীরা কোচদের থেকে উন্নত, আচার সংস্কারও ভিন্নতর। স্বাভাবিকভাবে কোচেদের মধ্যে নিজেদের রাজবংশী পরিচয় প্রবণতা তৈরি হয়। কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠা এবং রাজবংশী পরিচয় গ্রহণের মধ্য দিয়ে বিষয়টি সহজতর হয়।[১৬] ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও বলেছেন যে কোচেরা নিজেদের রাজবংশী পরিচয় দিতে গর্ববোধ করেন।[১৭] স্বাভাবিকভাবে কোচ সম্প্রদায়ের মানুষ রাজবংশী সমাজের মধ্যে সমন্বিত হয়েছে বলা যায়। আবার রাজবংশী জনগোষ্ঠীর একটা অংশ মঙ্গোলীয় নৃগোষ্ঠীর এটাও বলা যায়। পাশাপাশি এটাও সত্য যে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সবাই মঙ্গোলীয় গোষ্ঠীর নয় (বিশেষ করে রংপুর ও দিনাজপুর সন্নিহিত অঞ্চলের) রাজবংশীদের একটা বড় অংশ আর্য ছিল।[১৮] চেহারাগত দিক থেকেও সেটা পরিলক্ষিত হয়। রাজার আত্মীয় স্বজন যাদেরকে এই অঞ্চলের রাজবংশীরা বলেন রাজগণ, তাদের মধ্যে মঙ্গোলীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে গালের চোয়াল, নাক ও গাত্রবর্ণ সাধারণ দরিদ্র রাজবংশীর চেয়ে অনেক প্রকট।[১৯] এছাড়াও আরো একটি বিষয় প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের সীমান্ত অঞ্চল বিশেষ করে বর্তমান আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলার অবস্থান। পূর্ব উত্তরে আসাম, উত্তর ও উত্তর পশ্চিমে ভুটান ও নেপাল, পশ্চিমে বিহার। সেই সঙ্গে অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলার উত্তর পূর্বভাগের বিস্তৃত অংশ সুদীর্ঘকাল ভুটানের শাসনাধীন ছিল।[২০] ব্রিটিশের আগমনে ও হস্তক্ষেপে পরবর্তীকালে ক্ষমতার হস্তান্তর হয় মাত্র। স্বাভাবিকভাবে সীমান্তবর্তী বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিদের সঙ্গে রক্ত ও সংস্কৃতির সংশ্লেষণ ঘটে। তেমনি গাঙ্গেয় সংস্কৃতির প্রভাব মালদহ অঞ্চলের রাজবংশী সমাজের মধ্যে পড়ে। তাছাড়া রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ প্রধানত রংপুর, কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলাকে ঘিরে আবর্তিত হয়। সম্প্রসারিত হয়ে গোয়ালপাড়া ও উত্তরবঙ্গের অন্যত্র প্রবেশ করে।[২১] স্বাভাবিকভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় সম্প্রসারিত

হতে সময় লাগে, পরিবর্তনের প্রবণতাও কম। পরবর্তীকালেও মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে অরাজবংশী বর্ণহিন্দুদের আচার অনুষ্ঠানের প্রভাব অপেক্ষাকৃত বেশি পড়ে। তুলনামূলকভাবে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং দার্জিলিং জেলার সমতল ভাগে রাজবংশীদের আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে সমতা যেমন দেখা যায় তেমনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট সামঞ্জস্য লক্ষ করা যায়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী হাজার হাজার বছর ধরে নানাবিধ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সামগ্রিকভাবে লক্ষ করলে প্রতীয়মান হয় যে সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান এবং বর্ণহিন্দুদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে স্বতন্ত্রতা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিজস্ব ধর্মীয়-বিশ্বাস, আচার-সংস্কার, দেব-দেবী, প্রকৃতিভাবনা তথা জীবন-জীবিকায় ব্যতিক্রমী ভাবনা আজও নিভৃতে বহন করে রাজবংশী সমাজ। কিছু কিছু ক্ষেত্রে হিন্দুধর্মের সংস্পর্শে শাস্ত্রীয় রীতি-নীতি অনুসরণ করলেও জীবন ধর্মে লৌকিক অধ্যায়টি বিস্তৃত অংশ জুড়ে বহমান। তবে রাজবংশী সমাজজীবনের সঙ্গে বৃহত্তর বঙ্গজীবনের সাংস্কৃতিক সংশ্লেষণ (Cultural assimilation) উত্তরোত্তর ঘটতে থাকায় বর্তমান প্রজন্মের মেলামেশা, আদব-কায়দা, শিক্ষা-দীক্ষা, আদান-প্রদান, পোশাক-পরিচ্ছদ এমনকী চিন্তা-চেতনা মননভাবনার ক্ষেত্রে পরিবর্তন স্বাভাবিকভাবে ঘটেছে। সেই সঙ্গে বিশ্বায়নের প্রভাব, লোক-সাংস্কৃতিক পরিসরের সংকোচনে রাজবংশী সমাজেও সংস্কৃতির বিবর্তন নজরে পড়ে। সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও প্রাচীন-সংস্কার, রীতিনীতির পরিবর্তন লক্ষণীয়। তা সত্ত্বেও বলা যায়, রাজবংশী সমাজ-সংস্কৃতি ভিন্নতর গোষ্ঠী-পরিচয় বহন করে। যা আচরিত ক্রিয়াকলাপ কিংবা জীবনচর্যার বিভিন্ন পদক্ষেপে প্রতিভাত হয়।

রাজবংশী জনগোষ্ঠী সমাজ জীবন এবং মনন চর্যার যে ভিন্ন সংস্কৃতির ধারা ও ঐতিহ্য পালন করে, তা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। সুদীর্ঘকাল বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে সহাবস্থান, সংস্পর্শ, সংশ্লেষণ প্রভৃতি কারণে তারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী — সামাজিক ক্রিয়াকলাপে যেমন জন্ম, মৃত্যু, বিয়ে ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানে বর্ণহিন্দুদের অনুসরণ করলেও নিজস্ব লৌকিক আচার-সংস্কারের পর্বটিও নিষ্ঠা সহকারে পালন করে। সেখানে শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ কোনও বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি।

রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন প্রকার বিয়ের (যেমন — ঘরজেয়া বিয়ে, ঘর সোন্দানি বিয়ে, উঠানি বিয়ে, পানি ছিটা বিয়ে ইত্যাদি) প্রচলন কম হলেও বিয়ের বিভিন্ন পর্বে লৌকিক বিষয়গুলি আজও গুরুত্বপূর্ণ। যেমন — গুয়াকাটা অনুষ্ঠান, পানিছিটা বাপ, মিস্তর ধরা, আঠোয়ারি ভাঙ্গা, দানীবুড়ি ইত্যাদি পর্বগুলি যথাসম্ভব অনুসৃত হয়। মৃত্যুর ক্ষেত্রেও কিছু কিছু অনুষ্ঠান লৌকিক স্তরেই রাজবংশী সমাজ পালন করে। যেমন — ডোকা-ভাঙা, শ্মশানে বাঁশ পুঁতে নিশান টাঙানো, প্রেতকর্ম সম্পাদন, ধূমালী পারলৌকিক কীর্তন পর্ব এবং এছাড়াও আরও কিছু লৌকিক আচার বিচার। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রেও বর্ণহিন্দুদের প্রায় সকল দেব-দেবীর প্রতি বিশ্বস্ত থেকেও সারা বছর ধরে নিজস্ব দেব-দেবীর পূজা অর্চনা, ব্রতপালন, বিশ্বাস ও সংস্কারের মাধ্যমে নিজের ও পরিবারের মঙ্গল কামনা করে। বৃক্ষপূজা থেকে শুরু করে শিব, মনসা, কালী, বুড়া ঠাকুর, তিস্তা বুড়ি, মা লক্ষ্মী, সোনারায়ের গান, জাগ গান, বাঁশ খেলা, বুড়াবুড়ি, গোরখনাথের পূজা, ভাণ্ডানী প্রভৃতি দেবদেবীর পূজা অর্চনা, আচার সংস্কার সহকারে তারা পালন করে। এছাড়াও নানা ধরনের আঞ্চলিক লৌকিক দেব-দেবীর পূজা ও ধর্মীয় রীতির মধ্যে আমাতি বা অম্বুবাচী পালন, বিভিন্ন তিথি নক্ষত্রে সেবা নৈবেদ্য প্রদান, ধানের গাছি বোনা, ফুল আনা, যাত্রাপূজা, ব্যাঙের বিয়া ও হুদোম দ্যাওর পূজা, যাইটল বিষহরির পূজা ও গান, মাড়েয়া বিষহরির আসর, বিভিন্ন ধরনের কালী ও শিবের পূজা, মাশান ঠাকুরের পূজা, কার্তিক পূজা, চড়ক পূজা, গারাম ঠাকুরের পাটে পূজা, বিষমা বা বিষুয়া পরব পালন, দোল সওয়ারীর পূজা ও মেলা প্রভৃতি ছাড়াও বিভিন্ন নদীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা, বৃক্ষপূজা, বৃক্ষকে ঘিরে উৎসব সবেতেই লৌকিক রীতি-সংস্কারে রাজবংশী জনগোষ্ঠী নিবিষ্ট হয়। এছাড়াও তন্ত্রমন্ত্র, লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কারে পরিবার ও পরিবারের বাইরের কিছু অনুষ্ঠান সুদীর্ঘ কাল ধরে সম্পন্ন হয় একেবারে শাস্ত্রীয় রীতির বাইরে অবস্থান করে। সেখানে অনেক ক্ষেত্রে ধর্ম, বিশ্বাস ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। যেমন পীরের থানে হত্যে দেওয়া, মানত, পূজা প্রদান; বিভিন্ন মেলার আয়োজন ইত্যাদি বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে বরাবর ভিন্ন ভাবে আলোড়িত করে। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে অদ্ভুত এক সমন্বয় যেমন দৃশ্যমান, তেমনই ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রাচীন বৌদ্ধ প্রভাব থেকে শৈব, শাক্ত প্রভাব বর্তমান আবার বৈষ্ণব প্রভাবও কয়েক শতাব্দী ধরে প্রকট। অদ্ভুত সমন্বয় ও সাযুজ্যও লক্ষ করা যায়। এ-প্রসঙ্গে কোচবিহারের মদনমোহন মন্দিরের নাম উল্লেখ

করা যেতে পারে। আবার রাজবংশী পরিবারের ঠাকুর পাটে কালী, গাবুর, রাখাল, কুবের, শিব থেকে মাশান, সোনারায়, বুড়াঠাকুর, তিস্তাবুড়ি, গৌরাঙ্গ; এমনকী পীরবাবার থানেরও অদ্ভুত সমাবেশ দেখা যায়। দুধ, চিড়া, আটিয়া কলার (বিচি যুক্ত কলা) সাধারণ নৈবেদ্য দিয়ে বাড়ির গৃহকর্তাই অনায়াসে পূজা-অর্চনায় ব্রতী হয়। সেখানে মন্ত্র থাকলেও শাস্ত্রীয় নয়। আসলে রাজবংশী সমাজের ধর্মীয় আচার-সংস্কার লৌকিক অধ্যায়টি গুরুত্বপূর্ণ। সেখানে আর্য-অনার্যের বহু উপাদান লুকিয়ে আছে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন সূচিতে। প্রকৃতিবাদ তথা সর্বপ্রাণবাদে (Animism) রাজবংশী সমাজে বিশ্বাস আজও লক্ষণীয়। রাজবংশী সমাজে উর্বরা সংস্কৃতি (Fertility Culture) -র প্রভাব প্রায় সমস্ত আচার-সংস্কারে দেখা যায়। বিশেষ করে ব্রতকথা, বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজার প্রকার ভেদ এবং কৃষি-কৃত্যাদির বিভিন্ন পর্বে। মেচেনী, হুদোম দ্যাও, ভাণ্ডানী সবেতেই উর্বরা সংস্কৃতির উপাদান সক্রিয়। বট পাকুড়ের বিয়ের ক্ষেত্রেও তা দৃশ্যমান। সকল নদীই রাজবংশী সমাজের কাছে দেব-দেবী, দেবস্থান। নদী, জলকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার রীতি রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। যা জল সংস্কৃতির (water culture) উদাহরণ। নদীতে নদীতে আত্মীয়, পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ রাজবংশী সমাজ এটা বিশ্বাস করে। তাই তো বিশ্বাস ভাবনায় ধরলা তিস্তা নদীর স্বামী, করলা নদী আর দুলালী দীঘি সন্তান-সন্ততি।

আদিম সংস্কৃতির উদাহরণ বহন করে লৌকিক ও প্রাকৃত বিশ্বাসে। জাদু বিশ্বাস, তন্ত্রমন্ত্র সমাজ-সংস্কারে নিহিত আছে লৌকিক ধর্মের অবয়বে। রাজবংশী সমাজের ধর্মবিশ্বাস, আচার-বিচার, পূজা-অর্চনা, ব্রতকথার মূল উৎস জাদুবিদ্যা। রাজবংশীদের মধ্যে এই জাদুবিদ্যা, তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব জীবনচর্যার নানা স্তরে যেমন — সন্তান জন্মানোর নিয়মাচারে, রোগব্যাধির চিকিৎসায়, শুভাশুভ কামনায় ও দৈনন্দিন যাপন কার্যের পরতে পরতে সূক্ষ্ম ভাবে কাজ করে। রাজবংশী সমাজের লোক-সংস্কৃতির পরিসরটি আক্ষরিক অর্থে বিস্তৃত। আর এই পরিসরে ধরা পড়েছে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়। ফলে রাজবংশী সম্প্রদায় সুদীর্ঘকাল বিভিন্ন জনজাতির সঙ্গে সহাবস্থান এবং বর্ণ হিন্দুদের ধর্ম-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ রূপে বর্ণ হিন্দুর ধর্ম গ্রহণ করেননি, আবার তাদের অতীত কালের ধর্মীয় বিশ্বাস যেমন, পূজা উপলক্ষে গ্রামের মাঙ্গলিক থানে পশুবলী, নদ-নদীকে দেবতা জ্ঞানে পূজা-অর্চনা, বড় বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে তেল সিঁদুর মাখিয়ে প্রণাম ও প্রার্থনা জানানো প্রভৃতি ত্যাগ করেনি।

রাজবংশী জীবনের মঙ্গলবোধ, শ্রেয়োবোধ অতীত ধর্মবিশ্বাসই তাদের মধ্যে জাগ্রত।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহারাজ বিশ্বসিংহ ও তাঁর পুত্র মহারাজ নরনারায়ণের সময়কালে রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মধ্যে হিন্দু ধর্মবিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। বলা যায়, রাজবংশীদের বৃহৎ অংশ এই সময়ে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হয়ে পড়েন। রাজবংশী হিসাবে স্বতন্ত্র পরিচয়ের সূত্রপাত এই সময় থেকেই। অবশ্য সামান্য অংশ, কোচ পরিচয় নিয়েই থেকে যায় নিজস্ব গোষ্ঠী পরিচয় বহন করে। যদিও পরবর্তীকালে তারা বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের (পঞ্চানন বর্মার ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলন) মধ্য দিয়ে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র রাজবংশী জনগোষ্ঠীই নয়, কোচ-খেন-যুগী-জলধা ইত্যাদি জনগোষ্ঠীও সামিল হয়। এই প্রক্রিয়ার ধারা আজও অব্যাহত। পরবর্তীকালে বৈষ্ণব প্রভাবও এই জনগোষ্ঠীকে ধর্মীয় ভাবনায় সমৃদ্ধ করেছে। শংকরদেবের প্রভাব এক্ষেত্রে ব্যাপক। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মহারাজ হরেন্দ্রনারায়ণের সময়কালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং বলা যেতে পারে শৈব, শাক্ত ভাবনার সঙ্গে বৈষ্ণব ভাবনার মহাসম্মিলন ঘটে।

রাজবংশী সমাজের প্রধান আরাধ্য দেবতা — মহাদেব, কালী এবং মনসা দেবী। সামাজিক মঙ্গল সাধন, পারিবারিক সুখ শান্তি, সমৃদ্ধি, ফসল বৃদ্ধিকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু লৌকিক পূজা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। বিশেষ করে মনসাদেবীর পূজা পারিবারিক যে কোনও শুভকর্মের প্রারম্ভে সম্পন্ন হয়। কালীর তো বহু প্রকারভেদ। শিবও বিভিন্ন নামে পূজিত। বাণেশ্বর, ষণ্ডেশ্বর, জটেশ্বর, বটেশ্বর, জল্পেশ্বর আবার মাশান, সোনারায় সবই শিবের প্রকারভেদ। পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় ভূখণ্ড (জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার) তো শৈবভূমি হিসাবে আখ্যায়িত। মহাকাল হিসাবে শিব পূজা পেয়ে আসছেন প্রান্তীয় ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন জায়গায়। জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যে রাজবংশী সমাজে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজা প্রচলিত। ভাণ্ডানী, শালেশ্বরী, বিষহরি, বুড়াঠাকুর, গোরখনাথ, মহাকাল, সোনারায় এমনকী নবান্নোৎসবে শিয়াল ঠাকুরের নামেও অর্ঘ্য প্রদান করা হয়।

রাজবংশী সমাজে তন্ত্রসাধনার একটি পরিসর ছিল। ওঝা, ভৌরিয়ারা তার উদাহরণ। এর মূলে রয়েছে বৌদ্ধীয় প্রভাব। ময়নাগুড়ি (জলপাইগুড়ি) অঞ্চলে তন্ত্রসাধনার বেশ কিছু প্রাচীন ক্ষেত্রের চিহ্ন আজও বর্তমান। নেপাল, ভুটান সন্নিহিত পাহাড় সংলগ্ন তরাই ডুয়ার্স সহ কামরূপ-

কামাখ্যা ছিল সেকালের তন্ত্র সাধনার অন্যতম ক্ষেত্র। রাজবংশী সমাজে তন্ত্রমন্ত্র, তুকতাক্, তাবিজ-মাদুলি, ওঝা-কবিরাজের প্রভাব যথেষ্ট। রাজবংশী সমাজে প্রাচীনকাল থেকে ব্রতকথার প্রচলন আছে। আশা-আকাঙ্ক্ষানিষ্ঠ বিশেষ ধর্মাচারণের ক্ষেত্র হিসাবে ব্রতপালন অনতি অতীতে প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে প্রায় লুপ্তের পথে। যাইটল, সুবচনী, ধরমঠাকুর, ষাটপূজা, কাতিপূজা কোথাও কোথাও হলেও সংখ্যায় তা হাতে গোনা। আঞ্চলিক ভেদে আরও বহু দেব-দেবীর পূজা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। কোথাও কোথাও ব্যক্তি কিংবা কোনও শক্তি উৎসকেও দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়। যেমন — সন্ন্যাসীকাটা, ফালাকাটা, তুলাকাটা, মল্লিক ঠাকুর, রাজাঠাকুর এরকম স্থানিকভেদে বিভিন্ন ব্যক্তি দেবদেবীর পূজা অর্চনা রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। তা কখনও পরিবার কিংবা গ্রামকে ভিত্তি করে সম্পন্ন হয়।

রাজবংশী সমাজ মূলত কৃষিজীবী। যদিও হাল আমলে বৃত্তি পেশার প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে রাজবংশী সমাজ খাদ্যাভ্যাসে বেশ কিছু বিধিনিষেধ পালন করে। বিশেষ করে ক্ষত্রিয় আন্দোলনের পর সমাজ-সংস্কারের অংশ হিসাবে শূকরের মাংস, মদ ইত্যাদি বিষয়ে বিধিনিষেধ অনুসরণ করে। নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক গবেষকদের বক্তব্য থেকে জানা যায় যে রাজবংশীরা ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যখন একটু একটু করে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তখন থেকেই সমাজের মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে ধীরগতিতে। সেই সময় থেকে বলা যেতে পারে, তাদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিকতা থেকে পিতৃতান্ত্রিকতায় প্রবেশ করে। এই সময় থেকেই সমাজব্যবস্থায় নারীর তুলনায় পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।[২২] কিন্তু রাজবংশী সমাজ হিন্দুধর্ম গ্রহণ করার পর পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রবেশ করলেও তাদের অনেক সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা প্রভৃতি চলমান ছিল। রাজবংশী সমাজে অতীতে নারীদের বিশেষ ভূমিকা ও গুরুত্ব ছিল। বিধবা বিবাহ সুদূর অতীত কাল থেকে প্রচলিত। পর্দা প্রথারও বিশেষ প্রচলন ছিল না। রাজবংশী নারীরা পুরুষদের মতো সমানভাবে পরিবারের কাজকর্মে অংশ নিতে পারে। অতীতে 'কন্যা পণে'র বিশেষ প্রচলন ছিল। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে এই রীতির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। 'কন্যাপণে'র পরিবর্তে বর্ণহিন্দুদের মতো 'বরপণে'র প্রথা চালু হয়। ইদানীং সেটি রীতি হিসাবে প্রচলিত। 'বেটি ব্যাচে খাওয়ার' সেই প্রচলিত প্রবাদ এখন উলটো কথা বলে। 'ঘর জামাই' রাখার প্রথাও এখন অবলুপ্ত। বিয়ের অন্যান্য প্রকারগুলোও সচরাচর চোখে পড়ে না।

এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে, বিয়ে বিষয়ে বর্ণহিন্দুদের রীতি-নীতি বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছে। তবে লৌকিক বৃত্তটি এখনও রাজবংশী সমাজ মেনে চলার চেষ্টা করে। 'বৈরাতী' (বিয়ের রীতি-নীতি অনুসরণ করে এই বৈরাতী) এখনও সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেখানে প্রাচীন লৌকিক সংস্কার রীতিগুলো অনুসৃত হয়। রাজবংশী সমাজে বিয়ের ক্ষেত্রে বর্ণহিন্দুদের মতো 'গোত্র' মানা হয় না। রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাজবংশী সমাজে সমান্তরাল ভাইপো (Parallel Cousin) ও আড়াআড়ি ভাইপো (Cross Cousin) জ্ঞাতি-সম্পর্কিত লোকজনের সঙ্গে বিয়ে হয় না।[২৩] রাজবংশী সমাজে গোত্র বিভাগ (সবাই নিজেদের কাশ্যপ গোত্র হিসাবে পরিচয় দেয়) না-থাকলেও গোষ্ঠীভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা ছিল। একেকটি গ্রামে মাত্র কয়েকটি গোষ্ঠীর লোক বসবাস করতেন। ইদানীং আর্থ-সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনের ফলে সে ছবিটা পালটে গেছে। আজ থেকে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও রাজবংশী সমাজে একই গ্রামে ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিয়ে হত। কিন্তু বর্তমানে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও বর্ণ হিন্দুদের সঙ্গে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ায় একই গ্রামে বিয়ের সম্বন্ধ বিরলপ্রায় হয়ে উঠেছে। রাজবংশী সমাজে বর্তমানে একরৈখিক বংশধারাই (unilinial descent) প্রচলিত, আর তা হল — পিতৃসূত্রীয় (patrilinial), মাতৃসূত্রীয় নয়। কোচ সমাজে অতীতে মাতৃসূত্রীয় বংশধারা অর্থাৎ মাতৃতান্ত্রিক রীতিনীতি থাকলেও বর্তমানে তাদের মধ্যে পিতৃসূত্রীয় ধারাই প্রচলিত।

রাজবংশী সমাজে একাধিক সামাজিক স্তর (social startification) নেই অর্থাৎ এই সমাজে কোনও সামাজিক অসাম্য (social inequality) নেই বলে বিয়ে বা সামাজিক কোনও ক্রিয়াকাণ্ডে জাতিগোষ্ঠীর মধ্যেই সম্পন্ন হয়। সবাই কৃষির সঙ্গে সম্পৃক্ত। সেখানে গিরি (জমির মালিক) কিংবা আধিয়ার-প্রজার (যারা জমিতে ভাগচাষে যুক্ত) মধ্যে বৃত্তিগত কোনও প্রভেদ নেই। তবে সামাজিক মর্যাদা (status), সামাজিক আধিপত্য (social domination) কিংবা আর্থিক বিষয়গুলি গুরুত্ব পেত। বর্তমানে সে অবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ ইতিমধ্যে পেশাগত ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। সম্পূর্ণ ভাবে ভূমিনির্ভর সমাজ আর নেই। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে। যুক্তি-চিন্তারও বিকাশ ঘটেছে। ফলে সামাজিক বিন্যাসের ক্ষেত্রে পরিবর্তন এসেছে। এর প্রভাব রাজবংশী সমাজের সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। ঘরবাড়ি, খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে চিন্তা-চেতনায় তা লক্ষ করা যায়। ধর্মাচরণের ক্ষেত্রেও লৌকিক বৃত্তের সংকোচন

ঘটেছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে, শিক্ষিত লোকের মধ্যে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে ৯-১০ বছরের মধ্যে মেয়েদের বিয়ে হত। সে ধারার পরিবর্তন হয়েছে, বর্ণহিন্দুদের মতোই সময়-বয়স ধরে সম্পন্ন হয়। একাধিক বিয়ের অনুমতিও সমাজ আর অনুমোদন করে না। অতীতে এটা বহুল প্রচলিত ছিল, অবস্থাপন্ন পরিবার হামেশাই এটা করতেন। রাজবংশী সমাজে এখনও বিয়ে বা অন্য কোনও অনুষ্ঠানে 'অসমীয়া' ব্রাহ্মণের প্রতি ঝোঁক থাকলেও তথাকথিত ব্রাহ্মণদের দিয়ে কাজ করতে দ্বিধা করেন না। ওঝা, কবিরাজ, ভৌরিয়াদেরও সেই সামাজিক সম্মান নেই। সমাজে দেওয়ানীদেরও সে আধিপত্য নেই। জমিজমা কিংবা যে কোনও বিরোধের মীমাংসায় তাদের ডাক পড়ে না। রাষ্ট্রীয় আইন ও বিচার ব্যবস্থার অধীনে সামাজিক বিরোধের বিষয়গুলি নিষ্পত্তি হয়। সম্পত্তির ভাগীদার এখন মেয়েরাও। তারাও সমান অংশের অধিকারী। অতীতে ছবিটা অন্যরকম ছিল। পারিবারিক সংস্কারের ক্ষেত্রেও শিথিলতা লক্ষণীয়। রাজবংশী সমাজে স্ত্রী-মহিলারা বহুবিধ আচার সংস্কার মেনে চলেন। বিশেষ করে হিন্দুধর্মভুক্ত হওয়ার পর বহুবিধ আচার সংস্কারের অন্তর্ভুক্তি ঘটে। পরবর্তীকালে বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে আচার সংস্কারের যেমন পরিবর্তন ঘটে তেমনি ক্ষত্রিয়করণ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতেও তথাকথিত রাজবংশী সমাজের আচার সংস্কারের আরো কিছু পরিবর্তন ঘটে। সেইসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব তো ছিলই। বিশেষ করে বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে শুচিতা বিষয়ক নিয়ম আচারগুলি উল্লেখযোগ্য। বলা যেতে পারে প্রত্যুষে বিছানা ছাড়া থেকে রাতে শুতে যাবার আগে অবধি বহুবিধ আচার সংস্কার পালনীয় কর্তব্য হিসাবে সমাজে প্রচলিত। ভোরবেলা বিছানা ছেড়ে উঠোন ঝাড়ু দিয়ে গোবর জল ছেটানো প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে বিবেচিত। জনশ্রুতি ঝাট না দেওয়া বাসি উঠোনে পা রাখলে আয়ুক্ষয় হয়। উঠোন ঝাড়ু দেওয়ার জন্য আলাদা ঝাড়ু নির্দিষ্ট থাকে। রাজবংশী ভাষায় যা 'বান্নি' হিসাবে পরিচিত। ঘরের ভিতরে ঝাড়ু দেওয়ার জন্য আলাদা ঝাড়ু নির্দিষ্ট থাকে। বাসি থালা বাসন ধোওয়ার পর স্নান করে রান্না ঘরে প্রবেশের নিয়ম। রাজবংশী মহিলারা গোয়ালঘরেও অনেকে স্নান না করে প্রবেশ করেন না। স্নান না করে রান্না করা তো দূরের কথা এক গ্লাস জলও গুরুজন কাউকে দেন না। অনেকে রান্নার কাপড় চোপড় আলাদা রাখেন। এই কাপড় পড়ে বিছানায় বসা শোয়া কিংবা অন্য বাড়ি যাওয়ার নিয়ম নেই। গোবর দিয়ে লেপা মোছার বিষয়টি রাজবংশী মহিলারা যত্নের সঙ্গে মানেন। খাবার জায়গাটি মোছা নিয়ামাচারের

অবশ্য কর্তব্য। গোয়াল ঘর রাজবংশী সমাজের কাছে পবিত্র, ডাং ধরি দেবীর অবস্থান। শুচিতা বিষয়টি রাজবংশী মহিলাদের মধ্যে একটু বেশি, বাথরুমে গেলেও হাত-পা ধুয়ে ঘরে আসার নিয়ম। ঋতুস্রাবের সময় বেশ কিছু নিয়ামাচার মেনে চলে রাজবংশী মহিলারা। তিন-চারদিন রান্না করা, পূজার ঘর, গোয়াল ঘরে না ঢোকা, এমনকী জলের কল কিংবা কুয়ো ছোঁয়ায়ও নিষেধ। গবাদি পশুকেও ছোঁয়া নিষেধ। হাল্কা বিছানায় মাটিতে শোয়ার রীতিও অনেকে মানেন। যদিও আজকের সময়ে অনেক কিছুই শিথিল, গ্রামগঞ্জে একটু আধটু নিয়মাচার প্রচলিত শহরে দেখাই যায় না।

রাজবংশী মহিলারা সমস্ত তিথি নক্ষত্র পাল পরবে কিছু না কিছু নিয়ামাচার মেনে চলে। অন্নপ্রাশন, বিয়ে এমনকী মৃত্যু অশৌচের ক্ষেত্রে আচরণীয় কৃত্যাদি পালন করে। কিছু পূজা আচার মহিলারাই সম্পন্ন করে। বুড়াবুড়ি পূজা, কড়াকড়ি পূজা, কাতি পূজা, হুদোম পূজা, সুবচনী পূজা, লক্ষ্মীপূজা, বিষহরি ইত্যাদি পূজা ব্রতগুলিতে মহিলারাই নিয়ামাচারে পালন করে সংসারের কুশল কামনায়।

রাজবংশী সমাজে বার নক্ষত্রের গুরুত্ব সৌরতত্ত্বকে স্মরণ করায়। সূর্যের অবস্থান দেখে যেমন সময় নির্ধারণ করে তেমনি মঙ্গলবার, শনিবার খরা বার হিসাবে বিবেচিত। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্যা তিথিতে পোড়া খাওয়া, মাথায় সাবান দেওয়া, বাচ্চাদের চুল নখ না কাটা বিধি পালন করে। মাথায় সাবান দেওয়ার ক্ষেত্রেও নিষেধ পালন করে। রবিবার, বৃহস্পতিবার বাঁশও কাটে না। রাতে হলুদ না দেওয়া, সূচনা দেওয়ার নিয়ম পালন করে। রাতে সাপকে যেমন লতা হিসাবে, তেমনি হলুদকে রং আর চুনকে দই বলে চিহ্নিত করার রীতি প্রচলিত। অতীতে রাজবংশী মহিলারা কোথাও যাওয়ার সময় কাটারী নিয়ে যেত। বিশ্বাস লোহার এই কাটারী সঙ্গে থাকলে ভূত-দ্যাও-এর নজর থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। রাস্তায় যাওয়ার পথে নদী কিংবা ঠাকুরের পাট থাকলে গুয়া পান দেওয়ার রীতিও প্রচলিত ছিল। গরু নিয়ে একাধিক সংস্কার রাজবংশী সমাজে প্রচলিত ছিল। গাভী দিয়ে হাল না মারা, বিয়ের গাড়িও গরু নয় মোষের গাড়ি হত। গলায় দড়ি বাঁধা অবস্থায় গরু মারা গেলে গৃহকর্তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। গলায় দড়ি পেচিয়ে ভিক্ষা করে পুরোহিত ডেকে প্রায়শ্চিত্ত করার নিয়ম রাজবংশী সমাজে আজও প্রচলিত। প্রায়শ্চিত্ত না করলে সমাজ চ্যুত করত গ্রাম সমাজ।

অতীতে রাজবংশী মহিলারা স্বামীর নাম উচ্চারণ করতেন না। সন্তান-সন্ততিকে ঔষধপত্র মহিলারা খাওয়ানোর রীতি প্রচলিত ছিল। রাজবংশী সমাজে পাঁচ-ছয় দশক আগে রীতি ছিল মামা ভাগিনেয় বউমার সঙ্গে কথা বলবে না, তার হাত থেকে সরাসরি কোন বস্তু নিতে পারবে না। ভাই বউ-র সঙ্গে ভাসুরের সম্পর্কও ছিল কঠোর। কথা বলা তো দূরের কথা ছায়াও মারাবে না। অসুখ বিসুখ হলেও তার ঘরে প্রবেশ করতে পারবে না। হঠাৎ কোন ভাবে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে ভাসুরকে প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ সারাদিন উপোস করে রাতে আকাশের কয়েকটি তারা গুণে অন্ন গ্রহণ করতে হত। ভাই বউকে সবসময় সতর্ক থাকতে হত। তবে বর্তমানে বিধিনিষেধ অনেকটাই শিথিল হয়েছে। মামা শ্বশুর ও ভাসুর নিয়ে একটি সুন্দর প্রবাদ প্রচলিত ছিল —

আটো জাগা ঘন ভাসুর
তাতে আসিল মামা শ্বশুর।

অর্থাৎ বাড়িতে একাধিক ভাসুর বর্তমান থাকলে ভাই বউকে যথেষ্টই সংকুচিত থাকতে হয়, তারপরে যদি মামা শ্বশুরের আগমন ঘটে এবং ঘরের সংখ্যা কম থাকলে বউয়ের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পড়ত।

মহিলাদের চলাফেরায় কিছু রীতি আচার ছিল। চলাফেরা দেখেই মেয়ের গুণাগুণ বিচার হত। লোকপ্রবাদ প্রচলিত ছিল ‘মাও গুণে ছাও, কুলা গুণে বাও’। চলা-বলা, ছোঁয়াছুঁয়ি, কাজকর্ম বিষয়ে বেশ কিছু বিধিনিষেধ আরোপিত ছিল। ভাসুর, মামা শ্বশুর কিংবা মান্য ব্যক্তির সামনে মাথায় কাপড় অর্থাৎ ঘোমটা দেবার রীতি প্রচলিত ছিল। এমনিতে রাজবংশী সমাজে পর্দা নসীন বিষয়টি নেই। ভরদুপুর, সকাল, সন্ধ্যা, অমাবস্যা, সংক্রান্তি কিংবা শনিবার, মঙ্গলবার রাস্তাঘাটে বেরোনোর বিষয়ে এয়োতি স্ত্রীর কিছু লোকাচার ছিল।

রাজবংশী সমাজে ‘ছুয়া ঘর’ (প্রসূতি ঘর) তৈরির বিশেষ প্রচলন নেই। সাধারণত শোবার ঘরটিকে ধুয়ে মুছে প্রসূতির ঘর হিসাবে ব্যবহারের রীতি ছিল। ভাবী মাকে বেশ কিছু কঠোর নিয়ম রীতি পালন করতে হত। সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণের সময় ভাবী মা কিছু খাবে না। গ্রহণের সময় ভাবী মাকে শুয়ে থাকতে হবে। পানের পিক পেরোনো, ঘর মোছার ন্যাতা ডিঙোবে না, চাল ধোয়া কিংবা কাপড় নিংড়ানো জল ডিঙোবে না। সন্ধ্যায় দরজায় বসবে না। খোলা চুলে থাকবে না। দ্যাও ঠাকুরের কুনজর থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য আরো কিছু বিধিনিষেধ পালন করতে হত।

এসব সত্ত্বেও বলা যায়, রাজবংশী সমাজ জীবন নিয়ে পর্যালোচনা করতে হলে রাজবংশীদের উদ্ভব বিকাশ, অতীত আচরণ, ধর্মবোধ, আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি, কৃষি শিল্প, জীবনযাপন, বিভিন্ন অনুষ্ঠান, লৌকিক বৃত্ত ইত্যাদি বিষয় লক্ষ্য করতে হবে। এখনও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নিজস্ব গোষ্ঠীভাবনা, মৌলিকত্ব, মনন-চিন্তনের ভাব ব্যঞ্জনা, জীবন চর্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রাজবংশী সমাজের বিশেষত্ব ধরা পড়ে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের কৃষ্টি-সংস্কৃতি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে ড. চারুচন্দ্র সান্যালের অভিমত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি 'The Rajbanshis of North Bengal' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন :

> The study of folk life and culture of these people has become important when attitudes are changing has due to impact of western civilization and more so after partition of bengal when a large immigration of people from lower North and East Bengal is taking place in this area and within a very short time a profound culture mixing is sure to take place and some of the age long customs may disappear altogether.[২৪]

রাজবংশী সমাজ বিবর্তমান। ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে তা সংঘটিত হয়েছে। আর্থসামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন হয়েছে, ভৌগোলিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়েছে, শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে, সর্বোপরি মনন দর্শনেরও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। রাজবংশী সমাজের ধর্মকর্মাদি থেকে লোকায়ত পরিসর আচার সংস্কার, খাবার দাবার, পোষাক আশাক, রুচি ভাবনা সর্বোপরি সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলটিও পরিবর্তমান। সময় যাপন থেকে বিনোদন সবেতেই পরিবর্তনের ছোঁয়া, আধুনিকতার পরশ। তাই রাজবংশী সমাজের এই সাংস্কৃতিক বিবর্তন বিষয়টি বক্ষমান প্রকল্পের বিষয়। কারণ যে কোন জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিসরের মধ্যেই সেই গোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ভাষ্য লুকিয়ে থাকে। কারণ যে কোন

জনগোষ্ঠীর সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে হলে যেমন উদ্ভব, বিকাশ, অতীত, আচার, ধর্মবোধ, সংস্কার, সংস্কৃতির বিষয় জানতে হয় তেমনি তুলনামূলক আলোচনার নিরিখে বর্তমান সময়ের ধর্মচেতনা, দেবদেবীর প্রকারভেদ ও তাদের প্রকৃতি, পূজা উৎসব, ব্যবহৃত উপকরণ, লোকায়ত বৃত্ত, সঙ্গীত বিনোদন যাবতীয় বিষয়গুলি মূল বিবেচ্য। প্রসঙ্গত 'রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন' প্রকল্পে উক্ত বিষয়গুলিই মুখ্যত সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে উঠে এসেছে।

রাজবংশী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠান ক্ষত্রিয় সমিতি। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় কোচ ও রাজবংশী যে পৃথক জাতি এবং রাজবংশী যে ক্ষত্রিয় শ্রেণিভুক্ত এই আন্দোলন ক্ষত্রিয় সমিতির মাধ্যমে সংঘটিত হয়।[২৫] দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে তৎকালীন জনগণনা আধিকারিক ও 'ম্যালে ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের প্রতিবেদনে রাজবংশী ও কোচকে পৃথক পৃথক জাতি হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি পেতে অপেক্ষা করতে হয় আরো দীর্ঘ কয়েক বছর। ১৯৩১ খ্রিস্টাব্দের আদমসুমারিতে কোচ ও রাজবংশীদের শুধু পৃথকই নয় রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় হিসাবে স্বীকৃতি দেন। ক্ষত্রিয় সমিতির দীর্ঘ আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই স্বীকৃতি আদায় সম্ভব হয়। আন্দোলনে উঠে আসেন রাজবংশী সমাজের নবজাগরণের প্রতীক রায়সাহেব পঞ্চানন বর্মা। পঞ্চানন বর্মার নেতৃত্বে 'ক্ষত্রিয়করণ' আন্দোলনের মধ্য দিয়ে রাজবংশী জনগোষ্ঠী স্বতন্ত্রতার সঙ্গে 'রাজবংশী ক্ষত্রিয়' হিসাবে পরিচিতি পায়। তিনি ব্যক্তিগত উদ্যোগে রংপুর ধর্মসভা সহ বিভিন্ন শ্রেণির পণ্ডিত মহলের ব্যবস্থাপত্রে রাজবংশীদের ক্ষত্রিয় স্বীকৃতি আদায় করেন। যদিও কিছু ব্যক্তি এর বিরোধিতা করেন। পরবর্তীকালে তিনি রাজবংশী জনগোষ্ঠীকে তপশিলী তালিকাভুক্ত করতেও সক্ষম হন।

কোচ রাজবংশকে ঘিরেই বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠী সংগঠিত হয় এবং সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যগত দিক থেকে একটি স্বতন্ত্র ধারাও বহন করে কয়েকশ' বছর ধরে। কিন্তু লক্ষণীয় এই সাংস্কৃতিক ধারার বিবর্তন বিগত কয়েক দশক ধরে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ করে ধর্মবিশ্বাস, সংস্কারের লোকায়ত ভুবনটি ক্রমশ বিবর্তমান। প্রাচীন বেশ কিছু লোকাচার, সংস্কারের আনুষ্ঠানিক ধারা আজকে ক্রমশ লুপ্তপ্রায়। বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও ব্যাপক পরিবর্তন দৃশ্যমান। অবসর, বিনোদনের পরিসরটি সংকুচিত হয়েছে। লোকশিক্ষা ও বিনোদনের ক্ষেত্রগুলিও হারাতে বসেছে। লোকসাহিত্যের নানাবিধ উপাদান কিচ্চা (গল্প), প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া, গীত প্রায় লোকান্তরিত।

আধুনিক বৈদ্যুতিন মাধ্যমে গ্রামীণ পরিসরের ভুবনটি বিচ্ছিন্ন হতে বসেছে। ঐতিহ্য, পরম্পরার প্রতিও আস্থা কমেছে। মন্ত্রবিশ্বাস উধাও। সংস্কারাদির ক্ষেত্রেও শিথিলতা দৃশ্যমান। পূজা-পার্বণ বিবাহ, জন্ম কিংবা মৃত্যুজনিত অশৌচ পারলৌকিক ক্রিয়াদির আচার সংস্কারও অনেকক্ষেত্রে শিথিল হয়েছে। অনেক দেবদেবীর পূজা অর্চনাও লোকান্তরিত। যেমন ধরমঠাকুর, কাতি পূজার গান, হুদোম দ্যাওর গান ইত্যাদি। পূজাকেন্দ্রিক গীতগুলির অধিকাংশই হারিয়ে গেছে। আনুষ্ঠানিক গীতি সংগীতও বিশেষ শোনা যায় না। যেমন বিয়ের গীত। প্রকরণ পদ্ধতিও পরিবর্তিত। বহু দেবদেবীর সংযুক্তি ঘটেছে। যেমন - সরস্বতী পূজা, লক্ষ্মী পূজা, শারদীয়া দুর্গা পূজা। কিছু মৌলিক অনুষ্ঠান, যাত্রা পূজা, নয়া খৈ আমাতি, বিষুয়ার মত অনুষ্ঠানগুলি আজকে বেশিরভাগ পরিবার থেকে হারিয়ে গেছে। প্রথাগত জ্ঞানের (Indigenious knowledge) পরিসরটিও ছোট হয়েছে। পারস্পরিক আত্মীয়তার রীতি রেওয়াজও প্রায় লুপ্তপ্রায়। সখা-সখি, ভাদাভাদি, বিয়েতে মিস্তর ধরা, পানিছিটা বাপ-মার প্রথাও এখন প্রায় অবলুপ্তির পথে। গ্রামগঞ্জে এখনও কোথাও কোথাও প্রচলিত থাকলেও শহরাঞ্চল এলাকায় অবলুপ্ত। প্রকৃতি কেন্দ্রিকতা, প্রাকৃত ভাবনার সংকোচন ঘটেছে। সর্বোপরি ধর্মবিশ্বাসের ক্ষেত্রেও শিথিলতা এসেছে। অনেকে অনুকূল ঠাকুর, বালক ব্রহ্মচারী থেকে বৈষ্ণব ভাবনায় নিজস্ব লোকায়ত ভুবনটি বদলে নিচ্ছেন। বলা যায় রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিগত কয়েক দশকে দ্রুত ঘটেছে। আর্থসামাজিক কাঠামো বদলে যাওয়ায় আগের গ্রাম সমাজটি আর নেই। গ্রামের জনবিন্যাসে সংবদ্ধতা আগের মত অটুট নয়, বিভিন্ন কারণে বিচ্ছিন্ন। রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের ফলেও গ্রামের সরল সমীকরণে সমস্যা হয়েছে। গ্রাম সমাজ বিভাজিত হয়েছে। শিক্ষা, যোগাযোগ গ্রামগুলিকে স্বতন্ত্র করেছে নিজস্ব সাংস্কৃতিক ভুবনের ঐক্যবলয় থেকে। জীবনজীবিকা, পেশা-বৃত্তি বদলে যাওয়ার কারণেও সাংস্কৃতিক বলয় পরিবর্তিত হয়েছে। ধর্মভাবনারও সম্প্রসারণ ঘটেছে। বৃহত্তর হিন্দুধর্মের অংশ হয়ে অনেক কিছুর সংশ্লেষণ ও আত্তীকরণ ঘটেছে। আবার বিশ্বায়নের ঢেউ মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি দোলায়মান। বিগত কয়েক দশকে বৃহত্তর রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বলয় অনেকক্ষেত্রে বদলে গেছে। সত্তরের দশক থেকে এটা প্রকটভাবে ঘটেছে। এই বিবর্তমান সাংস্কৃতিক বলয়টিকে সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের নিরিখে তুলে ধরার প্রয়াসই এই গবেষণা প্রকল্প ‘‘উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তন : সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণ’’। আবার

উত্তরবঙ্গকে গবেষণার ক্ষেত্র পরিসীমা নির্বাচনের কারণ এই ভূখণ্ডে সমগ্র রাজবংশী সমাজের বৃহত্তর অংশ যেমন বসবাস করে তেমনি প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গের (কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং) পরিবর্তন যেমন উল্লেখযোগ্য তেমনি গাঙ্গেয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পরিবর্তনে সরাসরি প্রভাব ফেলে। আবার কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার প্রভাব সমতল এলাকার রাজবংশী সমাজের উপর পড়ে। পার্শ্ববর্তী নিম্ন আসামের রাজবংশী সমাজও প্রভাবিত হয়। স্বাভাবিকভাবে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিত আলোচনা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সর্বোপরি রাজবংশী নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ছবির অতীত ও বর্তমান সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তাছাড়া কোচ-রাজবংশকে ঘিরেই রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতি পাঁচশ' বছর ধরে যেমন সংগঠিত হয়েছে তেমনি বিভিন্নভাবে আবর্তিত হয়েছে। দেশভাগের আগে ও পরে বিস্তীর্ণ উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজ রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক কারণেও বহুপ্রকারে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। ফলে সংস্কৃতিগত দিক থেকে বিবর্তনের শিকার হয়েছে। এই প্রকল্পের মুখ্য বিষয় এই সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি ভাষ্য রচনা। যা নৃতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং অবশ্যই সমাজ প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণে বিভিন্ন প্রেক্ষিতে, সময়কেই তাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আশা বহুবিধ ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যেও রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের একটি ছবি এই গবেষণা প্রকল্পের মাধ্যমে সূচিত হয়েছে ভবিষ্যৎ সময়ের জন্য।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের অন্যতম দেবতা শিব।[২৬] তবে অতীতে রাজবংশী সমাজে শিব বিভিন্ন লৌকিক রূপেই পূজিত হত। কোন মূর্তির প্রচলন ছিল না। মাটির ঢিপি কিংবা পাথরই শিবের প্রতীক হিসাবে গণ্য হত। পূজা পদ্ধতিও ভিন্ন ভিন্ন ছিল। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের অন্তর্ভূক্তি ঘটেছে অনেক পরে। গাজা, ভাং, আটিয়া কলা (বীজ যুক্ত কলা), দই, চিড়েই ছিল মূল উপকরণ। জল বা দুধ ঢালার রীতি পদ্ধতি অনেক পরে প্রচলিত হয়। মূর্তির মধ্যেও শিব প্রথম দিকে পদ্মাসনে উপবিষ্ট ছিল না, এক হাঁটু মুড়ে বসার ভঙ্গিটি (রাজবংশী মানুষ যেভাবে মাটিতে খেতে বসে) প্রচলিত ছিল। আসলে শিবের লৌকিক রূপই ছিল মুখ্য। মহাকাল, সন্ন্যাসী, ধূমবাবা, যখাঠাকুর, মাশান, বুড়াঠাকুর[২৭] ছাড়াও আরো কিছু লৌকিক রূপে পূজিত হয়। গ্রাম ঠাকুরও শিব। গোষ্ঠী জীবনের প্রতীক। শিব পূজায় বলিও প্রচলিত ছিল। এখনও কিছু কিছু

মন্দিরে এই রীতি (যেমন বাণেশ্বর) প্রচলিত। ভুটান সংলগ্ন এলাকায় শূকর বলিও দেওয়া হত। কুমারগ্রামের মধ্য হলদিবাড়ীতে এই রীতি আজও প্রচলিত। তবে রাজবংশীরা এখন আর শূকর বলি দেয় না। বর্ণহিন্দুদের প্রভাবে শিবপূজার রীতি পদ্ধতি অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে। তবে লৌকিক রূপে শিবের পূজায় এখনও প্রাচীন রীতি পদ্ধতি অনুসরণের চেষ্টা করে রাজবংশী সমাজ। অবশ্য লৌকিক রূপের পূজার ক্ষেত্রও এখন সংকুচিত। গ্রাম ঠাকুরের পূজাই এখন অনেক গ্রামে হয় না। অন্যান্য দেবদেবীরও প্রভাব কমেছে, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এখন রাজবংশী সমাজেও শিবের মাহাত্ম্য ভিন্নরূপ, বলা যায় বর্ণহিন্দুদের দ্বারাই প্রভাবিত।

শুধু শিব নয় অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর প্রভাব রাজবংশী সমাজে কমেছে। কালী, বিষহরির প্রভাব থাকলেও অন্যান্য লৌকিক দেবদেবী সম্পর্কে আজকের প্রজন্ম অনেকটাই উদাসীন। ফলে বাৎসরিক কোন অনুষ্ঠানে সব দেবতাকে নৈবেদ্য নিবেদন করা হলেও অনেকে দেবদেবীর নামই জানেন না। অতীতে গ্রাম ঠাকুরের পাটে যে সব দেবদেবীর অবস্থান ছিল সে সংখ্যাটাও কমেছে। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার কিংবা জলপাইগুড়ি জেলায় গ্রাম ঠাকুরের পাট-ই উধাও হয়েছে। তবে শিলিগুড়ি, খড়িবাড়ি, তরাই অঞ্চলে কিংবা দিনাজপুরের দুই জেলায় কোথাও কোথাও দেখা যায়। তবে সে গৌরব নেই। দৈন্যদশা দেখে বোঝা যায় পরিবর্তনের স্রোত আছড়ে পড়েছে। শুধু আর্থ-সামাজিক কাঠামো নয় মনন, মানসিকতা বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটেছে। আরেকটি বিষয় সে সব অঞ্চলে নাগরিক সভ্যতার বিস্তার যত ঘটেছে সে সব অঞ্চল থেকে লৌকিক দেবদেবীগুলির প্রভাব কমেছে। অনেক বাড়িতেই ঠাকুরের পাট আর সেভাবে দেখা যায় না। তুলসী তলার পাশে অন্য দু-একটি দেবদেবীর অবস্থানের মধ্যেই সীমিত। আগের মত অধিকারী পুরোহিত দিয়ে বিভিন্ন পাল-পরবে নৈবেদ্য দেওয়ার রীতিও নেই। একমাত্র শুভ অশুভ কোন কারণে অধিকারী পুরোহিতের ডাক পড়ে। বলতে দ্বিধা নেই বর্ণহিন্দুদের প্রভাব এখন ঘরে বাইরে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকাল থেকে রাজবংশী সমাজে সংস্কৃতির বিবর্তন শুরু হয়। সাত-আটের দশকে সেটা তরান্বিত হয়। সে ধারা আজও বহমান। বরং বিভিন্ন আঙ্গিকে তা তরান্বিত হয়েছে। আদপে ধাপে ধাপে রাজবংশী সমাজ সংগঠনের পরিবর্তন ঘটে। তার প্রভাব পড়ে সরাসরি সমাজ সংস্কৃতির উপর। ব্রিটিশ কলোনিয়াল সময় পর্বে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতি যথেষ্টই সংগঠিত

ছিল। স্বাধীনতার সময় পর্বে রাজবংশী সমাজ ভাঙ্গনের সম্মুখীন হয়। দেশভাগের ফলে রাজবংশী জনগোষ্ঠী ছিন্ন ভিন্ন হয়। সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা তৈরি হয় প্রাদেশিক বিভিন্ন কারণে। ইতিমধ্যে ক্ষত্রিয় সমিতির কর্মব্যাপ্তিও সংকুচিত হয়। অভিবাসনের চাপ বাড়তে থাকে। ছয়ের দশকে জমিদার জোতদারদের অবসান ঘটে। সাতের দশকে ভূমি সংস্কার আন্দোলনে অধিকাংশ রাজবংশী পরিবার প্রান্তিক চাষিতে পরিণত হয়। অনেকে সর্বস্বান্ত হয়। আটের দশকে আবার এক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। ক্ষোভ বিক্ষোভ আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। যাটের দশকের উত্তরাখণ্ড আন্দোলন, সাতের দশকের 'উতজাআস' আন্দোলনকে ছাপিয়ে শুরু হয় কামতাপুরী আন্দোলন। নয়ের দশকে বিশ্বায়নের ঢেউও আছড়ে পড়ে। পাশাপাশি সময়ে প্রান্তীয় উত্তরবঙ্গ জুড়ে শুরু হয় গ্রেটার কোচবিহার আন্দোলন। ভাষা সংস্কৃতির সঙ্গে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিভিন্ন দাবী দাওয়ার বিষয়গুলি উঠে আসে। বলতে দ্বিধা নেই এইসব আন্দোলন পর্বে ভাষা, সমাজ সংস্কৃতির বিষয়টি সম্পর্কে রাজবংশী জনগোষ্ঠী সচেতন হয়ে ওঠে। কিন্তু ততদিনে রাজবংশী সমাজ অনেকটাই বাঙালীয়ানায় সংশ্লেষিত (assimilation) হয়ে যায়। আর্থসামাজিক কাঠামো ভেঙে পরিবর্তিত হয়। ছোট হলেও একটা মধ্যবিত্ত সমাজ (চাকুরিজীবী, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে) তৈরি হয়। কিছু মানুষ জীবনজীবিকার তাড়নায় ভূমি থেকে বিচ্যুত হয়ে ভিন রাজ্যে কিংবা অন্যত্র পাড়ি দিতে বাধ্য হয়। আর অধিকাংশ রাজবংশী মানুষ প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির কিছুমাত্র বহন করে বর্ণহিন্দুদের আদব কায়দা, পোশাক পরিচ্ছদ, চাল চলন, সংস্কৃতি এমনকী মননভাবনায় গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে রাজবংশী সমাজ ভাবনাও পাল্টে যায়। আধুনিক কলা কৌশল, প্রযুক্তিকে গ্রহণ করে, শিক্ষার ব্যাপারেও আগ্রহী হয়ে ওঠে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসরের চেষ্টায় অবকাশ বিনোদনের মানসিকতারও পরিবর্তন হয়। নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতিও খানিকটা উদাসীনতা কার্যকরী হয়। সব মিলিয়ে পরিবর্তনের স্রোত বেগবান হয়। রাজবংশী মানুষ সম্পর্কে এমন আর বলা যায় না যে "খাওয়া আর গান পাইলে রাজবংশী মানুষ আর কিছু চায় না।" রাজবংশী সমাজ এখন এক প্রতিযোগিতার মধ্যেই আবর্তিত। স্বাভাবিকভাবে সামগ্রিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারই প্রতিফলন ঘটছে। এতদসত্ত্বেও বলতে হয় রাজবংশী জনগোষ্ঠী কিন্তু এখনও প্রাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অনুসারী। অনেক বাধা বিপত্তি সমস্যার মধ্যেও নিজস্বতা ধরে রাখার চেষ্টায় ব্যাপৃত। এখনও তাই গ্রামগঞ্জ কিংবা পরিবারে প্রাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতি, আচার সংস্কার,

লৌকিক দেবদেবী, থান পূজা পরব কিংবা সাংস্কৃতিক পরিসরের খোঁজ মেলে। এটাই তো নৃ-গোষ্ঠীর পরিচয় কিংবা নৃতাত্ত্বিক প্রেক্ষিত যা একটি জাতি বা গোষ্ঠীকে স্বাতন্ত্র্যতা দেয়। রাজবংশী সমাজ সেটা এখনো নৃতাত্ত্বিক ভাবেই ধরে রেখেছে।

চারুচন্দ্র সান্যালের 'দি রাজবংশীজ অব নর্থবেঙ্গল' এবং গিরিজাশংকর রায়ের 'উত্তরবঙ্গে রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ' গ্রন্থ দুটি রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ। রাজবংশী জনগোষ্ঠীর নৃতাত্ত্বিক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট থেকে পূজা-পার্বণ, জীবনাচার, ধর্মকর্ম বিস্তৃত বিষয় সম্পর্কে আমরা এই গ্রন্থ দুটি থেকে জানতে পারি। কিন্তু সময়কালের প্রেক্ষিতে যেমন সমাজ কাঠামো বদলায় তেমনি সমাজ সংস্কৃতির যাবতীয় উপাদানগুলিও পরিবর্তিত হয়। ড. সান্যাল তার গ্রন্থে এই বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে জীবনাচার ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়টিকে তিনি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করেছেন। সেই সূত্র ধরে এই প্রকল্পের অবতারণা। উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক পরিবর্তন বিভিন্নভাবে সংগঠিত হয়েছে সেটাই প্রকল্পের মূল প্রতিপাদ্য। তথ্যানুসন্ধান পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে কারণ ও সম্ভাবনা নিয়ে বিষয়ের পরিসর বিস্তৃত হয়েছে। ক্ষেত্র হিসাবে উত্তরবঙ্গ নির্বাচনের কারণ এই সাতটি জেলার জনবিন্যাস এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের বিষয়গুলি বিভিন্নভাবে স্পষ্ট হয়। আবার কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি কিংবা দার্জিলিং-এর সমতল ক্ষেত্রের মধ্যে সমতা দেখা যায় কিন্তু মালদহ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ক্ষেত্রে গাঙ্গেয় প্রভাব লক্ষণীয় ভাবে বেশি। স্বাভাবিকভাবে এই বিস্তৃত উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের পরিবর্তনের ধরন প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

যে কোন গবেষণা প্রকল্পের নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও অভিমুখ থাকে। সেই নিরিখে গবেষণা প্রকল্পের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্দিষ্ট হয়। আবার প্রকল্প রূপায়ণে নির্দিষ্ট কিছু রীতি পদ্ধতি এবং উপাদানকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। সেইসঙ্গে বিভিন্ন কৌশল ও অনুধাবনের বিষয়গুলিও নির্ধারিত হয়। তবে এই গবেষণা প্রকল্পে মূলত পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণমূলক (observation and participatory observation) পর্যবেক্ষণ বিষয়গুলি গুরুত্ব পেয়েছে। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস (social classification) জাতি পরিচয়, নির্মাণ, ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির নানা বস্তুগত ও অবস্থাগত বিষয়গুলি সংগ্রহের জন্য পর্যবেক্ষণ ও অংশগ্রহণমূলক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ফলপ্রসু ভূমিকা

রাখে। সেই অনুসারে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রানুসন্ধানের মাধ্যমে জীবন ধারণ পদ্ধতি, সামাজিক রীতিনীতি, আচার-সংস্কার, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উৎসবাদি সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকারে ও আলোচনার ভিত্তিতেও বহুবিধ তথ্যাদি সংগৃহীত হয়েছে। কিছুক্ষেত্রে চেকলিস্টও অনুসরণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতির গ্রহণ বর্জন ঘটতে থাকে। রাজবংশীদের সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালি সমাজ সংস্কৃতির সংশ্লেষণ (assimilation), আত্তীকরণ (acculturation) এবং অনেক ক্ষেত্রেও অনুকরণের (Imitation) বিষয়টি গুরুত্ব পায়। মেলামেশা, শিক্ষা-দীক্ষা, আদান প্রদান এবং একই ভাষায় কথা বলা ও একসাথে বসবাসের ফলে চিন্তা, বিবেক, মনন, সংস্কৃতির আদান প্রদান ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। সহজে পার্থক্য নিরূপণ করাও সর্বক্ষেত্রে সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও বলা যায় বাঙালি সমাজের সঙ্গে রাজবংশী সমাজ মিলেমিশে থাকলেও প্রাচীন ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এখনও অনুসরণ করে। মনন চিন্তনেও নিজস্ব ঐতিহ্য কৃষ্টিকে অস্বীকার করে না। অনেক কিছু বর্ণহিন্দু বা বাঙালি সংস্কৃতির প্রভাবে বিবর্তিত হলেও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়নি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন ব্যাপক এমনকী লোকান্তরিত হলেও একটা অংশ কিন্তু যথেষ্টই সচেতন এবং তারা নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি ধরে রাখার বিষয়ে সংরক্ষণশীল ও উদ্যোগী। সরকারি, বেসরকারি উদ্যোগেও কিছু কিছু প্রয়াস বিভিন্ন ভাবে দেখা যায়। সেটা ভাষা আকাদেমি থেকে রাজ্যস্তরের ভাওয়াইয়া উৎসব তারই সাক্ষ্য দেয়। আবার বেসরকারি উদ্যোগেও সাংস্কৃতিক ধারাটি অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস লক্ষ করা যায়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ভাষা সাহিত্যের চর্চা সংস্কৃতি চর্চারই একটি বলিষ্ঠ অংশ। এটাও রাজবংশী সমাজে বিগত কয়েক দশকে উল্লেখযোগ্যভাবে দেখা যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক বিবর্তনকে মাথায় রেখে এই প্রয়াস ও চেষ্টা অবশ্যই উল্লেখ্য এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

বিভিন্ন অধ্যায়ে এই বিবর্তনের বিষয়টিকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে যেমন রাজবংশী সমাজের নৃগোষ্ঠীগত ও ঐতিহাসিক পরিচয় বিষয়ে তুলে ধরা হয়েছে তেমনি দ্বিতীয় অধ্যায়ে কোচ রাজবংশের প্রেক্ষাপটে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। রাজবংশী সমাজের হিন্দুত্বকরণ, মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা, শংকরদেবের আগমন ও প্রভাব সেই সঙ্গে চৈতন্যীয় প্রভাবের বিষয়টিও আলোচনায় সংবলিত হয়েছে। মূলত ধর্ম পরিসরে

রাজবংশীদের লোকায়ত ভুবন ও ধর্মীয় সংস্কৃতির বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা থেকে রাজবংশী সমাজজীবন, সমাজ কাঠামো, বিশ্বাস ভাবনা ও আন্তঃগোষ্ঠী সম্পর্কের আলোচনা বিস্তারিত হয়েছে। ক্ষত্রিয় আন্দোলনের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দেয় এই সময়কালে। চতুর্থ অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলা যেতে পারে এই সময়কাল থেকে রাজবংশী সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তন শুরু হয়। স্বাধীনতা, দেশভাগ এবং ধারাবাহিক অভিবাসনের ফলে জনবিন্যাসের সঙ্গে সমাজ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। জোতদার শ্রেণির অবসান, আধিয়ারদের সংকট, জীবন জীবিকায় প্রতিযোগিতা, কৃষি প্রযুক্তির ব্যবহার, যোগাযোগ, শিক্ষার প্রসার নানাবিধ কারণে গ্রাম সমাজ তথা রাজবংশী সমাজের পরিবর্তন ঘটে। বিশ্বায়নের প্রভাব, তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অতিরিক্ত কিছু সমস্যার সৃষ্টি করে। সেই সঙ্গে ক্ষোভ, দাবি-দাওয়া, আন্দোলন ইত্যাদিরও উদ্ভব হয়। সব মিলিয়ে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তন বিভিন্নভাবে পরিলক্ষিত হয়। বর্ণহিন্দুদের প্রভাব প্রতিপত্তি, রাজবংশীদের মধ্যে একটা শ্রেণির উদাসীনতা ও মধ্যবিত্ত সমাজের সৃষ্টি এই পরিবর্তনকে তরান্বিত করে। আবার একটা শ্রেণির মধ্যে সমাজ সংস্কৃতি রক্ষায় উদ্যোগী হওয়া এটাও স্বাধীনোত্তর সময়কালে দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবে এই সময়কালটি রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়ে সাহিত্যে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির বিষয়গুলি বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে অনুধাবন করা হয়েছে। রাজবংশী সমাজের বিস্তৃত লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার, কোচ-মহারাজাদের সাহিত্যপ্রীতি এবং অনুবাদ সাহিত্যচর্চায় পৃষ্ঠপোষকতা, বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস, গল্প, প্রবন্ধে রাজবংশী সমাজ ও সংস্কৃতির সমীক্ষণে সময়কাল ও বিবর্তনের বিষয়টিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে সাংস্কৃতিক সচেতনতার অনুষঙ্গ হিসাবে রাজবংশী সাহিত্যচর্চার যে পরিসরটি বিগত কয়েক দশকে বিস্তৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যানে রাজবংশী সমাজ, সংস্কৃতি ও মনন ভাবনার বিবর্তনের বিষয়টির উপর আলোকপাত করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে সাহিত্য সৃজনের মধ্যে থেকে রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের বিষয়টিকেও এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হয়েছে।

রাজবংশী সমাজের সাংস্কৃতিক রূপান্তরের ধারাটি বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হতে থাকে। রাজবংশী সমাজের লোকায়ত সংস্কৃতি থেকে পূজা পার্বণ, আচার সংস্কার সর্বোপরি ধর্মীয়

সংস্কৃতির পরিবর্তনও সম্পাদিত হয় সমাজ প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ধারায়। সেখানে গ্রহণ বর্জন যেমন আছে তেমনি বিভিন্ন বিষয় গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়। তা সত্ত্বেও রাজবংশী জনগোষ্ঠী তাদের চিরায়ত সাংস্কৃতিক ভুবন, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, আচারের প্রতি সংরক্ষণশীল মানসিকতাও পোষণ করে। স্বতন্ত্র গোষ্ঠী পরিচয় এবং নৃ-গোষ্ঠীগত বিভিন্ন বিষয়গুলিকে ষষ্ঠ অধ্যায়ের আলোচনার পরিসরে উত্থাপন করা হয়েছে। দলিল দস্তাবেজ, ঐতিহাসিক তথ্য গবেষণা পত্র, পুস্তক, প্রবন্ধ, ক্ষেত্র সমীক্ষা, সমীক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রকল্প বিষয়টিকে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১. MacIver and Page, Society, 2004

২. Taylor, E B; Primitive Culture, 1958; John Murrey, London

৩. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XVII

৪. Martin, Montgomary; The History, Antiquity, Topography and Statistics of Eastern India, 1933, Page - 538

৫. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়; ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পাদিত), ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২ পৃষ্ঠা - ১৫৭

৬. Risley, H. H.; The Tribes and Castes of Bengal, Vol I, 1891, P - 491

৭. Risley, H. H.; The Tribes and Castes of Bengal, Vol I, Ibid P - 491

৮. Chatterjee, Sunity Kumar; Kirat Jana Krti, (1951), Page - 54

৯. Imperial Gazetteer, 1908, Vol X, Page - 383

১০. Chatterjee, S. K.; The Origin and Development of the Bengali Language (1926) Part - I, Page - 69

১১. Chatterjee, S. K.; Kirat Jana Krti (1951) Page 61

১২. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XXII

১৩. Barman, Binay; Research Article "Panchanan Barma's role in contemporary Rajbanshi Society of North Bengal, Shesadri Prasad Bose
Regional History & their possibilities" Kol. P - 147

১৪. Chatterjee, Sunity Kumar; ODBL (1926), Part - I, P - 78-79

১৫. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পাদিত), ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন এল পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৭২

১৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর ও দাশগুপ্ত, অভিজিত; জাতি, বর্ণ ও বাঙালী সমাজ, দিল্লী, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা - ১৬৮

১৭. Chatterjee, S. K.; Kirat Jana Krti (1951), Kol, Page 61

১৮. বর্মন, কার্তিক চন্দ্র; দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার রাজবংশী জাতি বিবর্তনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, বিনয় বর্মন ও কার্তিক চন্দ্র বর্মন (সম্পা) History of Culture of North Bengal, Pragotishil Prakashak 37 A, College Street, Kol -73, 2015, Page 329

১৯. বর্মা, সুখবিলাস; রাজবংশী সমাজের আত্মপরিচয়, ইছামুদ্দিন সরকার (সম্পাদিত), ঐতিহ্যে ও ইতিহাসে উত্তরবঙ্গ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, ২০০২, পৃষ্ঠা - ১৬৯

২০. খান চৌধুরী, আমানত উল্লা; কোচবিহারের ইতিহাস (১ম খণ্ড), ১৯৩৬

২১. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XVI

২২. আহমদ, ওয়াকিল; বাংলা লোকসংগীত: ভাওয়াইয়া, (ঢাকা, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৯৫), পৃ. ৯, মুখবন্ধ

২৩. দেব, রণজিৎ; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জীবন ও সংস্কৃতি, রতন বিশ্বাস সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৮

২৪. Sanyal, Charu Chandra; The Rajbansis of North Bengal, (Calcutta: The Asiatic Socity of Bengal, 1965), Preface

২৫. বর্মন, উপেন্দ্রনাথ; রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির ইতিহাস, জলপাইগুড়ি, ১৯৪১, পৃষ্ঠা - ২১

২৬. রায়, গিরিজাশংকর; উত্তরবঙ্গের রাজবংশী জাতির পূজা-পার্বণ, এন. এল. পাবলিশার্স, ডিব্রুগড়, অসম, পৃষ্ঠা - XXIV

২৭. ঐ, পৃষ্ঠা - ১৪